বাংলাদেশের উপন্যাস

মাসুদুজ্জামান

কালের কুহক ও বাংলাদেশের উপন্যাস

কালের কুহক ও পাঠকচি

কিছুদিন পর পর একদল তণ পাঠকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে আমি একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিই 'তোমরা কি বাংলাদেশের উপন্যাস/ কবিতা পড় ?' এই গোষ্ঠীটা, বলা বাহুল্য হবে না যে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ---ঢাকা ৰিবিদ্যালয় - পড়ুয়া শিক্ষার্থীদল। এদের সবাই মোটামুটি মেধাবী, সচেতন, বুদ্ধিদীপ্ত। পড়াশোনার অংশ হিসেবে ত াদের কিছুটা সাহিত্যও পড়তে হয়। দু'ধরনের সাহিত্যই তারা পড়ে--- বাংলা ও ইংরেজি। আমি তাদের শিক্ষক --- বাংলা সাহিত্যের কিছুটা অংশ আমাকে তাদের পড়াতে হয়। প্রশ্নটা যখন করি, তখনও তাদের সাহিত্য পড়ান শু করিনি। ঐ প্রশ্ন দিয়েই তাদের ভাবী সাহিত্যপাঠ শু হল। যথারীতি এর যে উত্তর পেয়ে যাই, তাতে এতটুকু বিস্মিত হইনা। প্রতিবছরই আমি এই ধরনের ক্লাশ শুর আগে শিক্ষার্থীদের সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতা কতটুকু জানবার জন্যে টুকটাক প্রশ্ন করি। উত্তরও পেয়ে যাই প্রায় একই ধরনের 'না স্যার, বাংলাদেশের উপন্যাস/কবিতা তেমন একটা পড়ি না'; অথবা 'মাসুদ রানা পড়েছি'; অথবা 'হুমায়ুন আহমদের উপন্যাস দু-একটা পড়েছি'; ব্যাস, ওইটুকুই। এইরকম উত্তর পাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই আমার পরের প্রশ্ন 'কেন পড় না?' উত্তরগুলোও আসে প্রায়ই একইরকম 'ভ াল লাগেনা'; অথবা 'উপন্যাস পড়ে কী হবে স্যার'; অথবা 'উপন্যাসের চাইতে টিভি/ সিনেমা দেখতে বেশি ভাল লাগে' এইরকম উত্তর প্রায় বাঁধা---অর্থাৎ বেশিরভ াগ শিক্ষার্থীই এইরকম উত্তরই ঘুরিয়ে - ফিরিয়ে দেয়। দু-একজন বলে তারা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বা সমরেশ মজুমদার পড়ে। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠ ানের সর্বোচ্চ মেধার ছাত্র - ছাত্রীদের সাহিত্য - পাঠের এটাই হচ্ছে 'গড়' নমুনা।

সাধারণভাবে বলতে গেলে সাহিত্যপাঠের প্রতি আমাদের পাঠকদের অনুরাগ ততটা উল্লেখযোগ্য নয়। একমাত্র হুমায়ুন আহমেদ ছাড়া বাংলাদেশের লেখকদের উপন্যাসের কাটতি তেমন ভাল নয়। হ্যাঁ, একুশের প্রতিটি বইমেলাতেই বেশকিছু উপন্যাস বের হয়, উপন্যাসই বিক্রি হয় সবচেয়ে বেশি, তারপরও আমাদের প াঠকসংখ্যা সীমিত। আসলে আমাদের পাঠের অভ্যেসই আশঙ্কাজনকভাবে কম। তাহলে আরও একটা গল্প বলি। উচ্চতর একটা ডিগ্রি পাওয়ার জন্যে কয়েক বছর আমাকে কোলকাতায় থাকতে হয়েছিল। যে - ৰিবিদ্যালয়ে আমি পড়তাম তার কাছেই ছিল ছোট্ট একটা বইয়ের দোকান। বই কেনাকাটার সুবাদে অল্পদিনের মধ্যেই দোকানের মালিকের সঙ্গে আমার বেশ সখ্য হয়ে যায়। একদিন দু'দিন পরপরই আমি তার ওখানে ঢুঁ মারতাম। কিন্তু মাঝে - মাঝেই দেখতাম, সারাদিনের জন্যে তিনি উধাও। দোকানে অন্য একজনকে বসিয়ে রেখে সেই সকালে বেরিয়েছেন, ফিরবেন বিকেলে। বিকেলে তাকে ধরে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেই বলতেন, 'দাদ া, একটু অপেক্ষা কন, নিজেই বুঝতে পারবেন।' আমি হয়ত এই - বই সেই - বই দেখছি, হঠাৎ এসে হাজির হল কয়েকজন তণী কিংবা মাঝ বয়সের গম্ভীর কয়েকজন পুষপাঠক। কথাবার্তা আর চালচলন দেখে বোঝা যায়, তণীরা এখনও শিক্ষাঙ্গনের গণ্ডি পেরোয়নি, পুষপাঠককুল কোন অফিসের হয়তো করণিক কিংবা নিচের দিকের কর্মকর্তা। সবাই ঠিক ঐ দিন প্রকাশ পাওয়া কোন একটা উপন্যাস কিনতে চাইছেন আর ঐ দোকানদার একটা বড় সাইজের প্যাকেট খুলে তাদের হ াতে আনকোরা বই ধরিয়ে দিচ্ছেন। দাম মিটিয়ে এভাবেই পাঠক - পাঠিকারা নতুন বই কিনে বাড়িমুখো হচ্ছেন। ততক্ষণে আমার বোঝা হয়ে গেছে, ক্ষুদ্র ওই বইয়ের দোকানের মালিক সারাদিন কোথায় ছিলেন। আমাদের যেমন বাংলাবাজার, তেমনি কোলকাতার বইয়ের কেন্দ্রীয় বাজারটি হচ্ছে কলেজস্ট্রিট। যেদিন নামী কোনও লেখকের বই প্রকাশিত হয়, সেদিনই কোলকাতা বা কোলকাতার বাইরের ছোটো ছোটো বুকস্টলের মালিকেরা নিজ নিজ চাহিদামাফিক নতুন বই সংগ্রহ করেন। পরে অনেকবার কলেজস্ট্রিট গিয়ে আমি বই সংগ্রহের এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখেছি---রীতিমতো লাইন দিয়ে দোকানি বা পাঠকেরা বই কিনছে। শুধু প্রক াশের প্রথম দিন নয়, কয়েকদিন পর্যন্ত নতুন বই কেনার এই ভিড় প্রকাশকের দোকানে লেগে থাকে। ঢাকায় এরকম ভিড় শুধু বাংলা একাডেমির একুশে ফেব্রুয়ারির বইমেলায় দেখা যায়।

আমার এত কথা বলার কারণ একটাই---আমাদের অর্থাৎ বাংলাদেশের পাঠকদের বই পড়ার অভ্যেস যে কত কম সেটা বোঝানো। শুধু কি বই পড়া? পাঠক কম বলে এখানে বই প্রকাশ পায় কম। কারণ বাজার ছোটো। এই ছোট্ট বাজারের বড়ো অংশটাই অবশ্য দখল করে আছে উপন্যাস। কিন্তু এর পাঠকসংখ্যা যে কত সীমিত, একটুআগেই সেকথা উল্লেখ করেছি। সংকটের শেকড় অবশ্য আরও গভীরে প্রোথিত বলে মনে হয়। বাংলাদেশের উপন্যাস পাঠকেরা আবার যে-ধরনের উপন্যাস পড়েন তার অধিকাংশই একধরনের হালকা, চটুল, স্যাঁতসেতে জনপ্রিয় উপন্যাস। যেসব উপন্যাসের বিষয়আশয় গভীর, মর্মভেদী;প্রথাসিদ্ধ ফর্মকে অস্বীক ার করে নিরীক্ষাধর্মী আঙ্গিক আর ভাষায় লেখা, সাধারণ পাঠক সেইসব উপন্যাস পড়তে চান না। জরিপ করলে অবশ্য বোঝা যেত, তবে আমার ধারণাআমাদের প াঠকদের বড়ো অংশ হচ্ছে সেইসব টিনএজার, যারা অনির্দ্দেশ্য রোমান্টিক জীবন, এলোমেলো জীবনযাপন বা ঘুরে বেড়াবার গোপন বাসনা নিজেদের মধ্যে লালন করে থাকে। বাস্তবে এসব করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না, কিন্তু উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে এই মানসবিহারে তারা বেরিয়ে পড়তে চায়। আর তখনই তারা আঁকড়ে ধরে হুমায়ু আহমেদের মতো চরিত্রসর্বস্ব উপন্যাস, তরতর করে যা একবারে পড়ে উঠা যায়। দ্বিতীয় ৰিযুদ্ধের পর ইউরোপের এই ধরনের কিছু উপন্যাস লেখা হয়েছিল, যাদের নায়ক 'আউটসাইডার' বলে খ্যাতি পেয়েছিল। কিন্তু অস্তিত্বেরটানাপোড়েন আর দার্শনিক বোধের কারণে সেই চরিত্রগুলো ছিল অনেক গভীর। এখানেও কী সাম্প্রতিককালে কোনও কোনও ঔপন্যাসিক এই ধরনের বা তারচেয়েও উজ্জ্বল ভিন্ন ধরনের উপন্যাস লিখছে না? সমকালের কুহক আর পাঠকের স্যাঁতসেতে চিকে এড়িয়ে উপন্যাসচর্চার একটি ক্ষীণ অথচ সমৃদ্ধ ধারা যে গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে, অনুসন্ধিৎসু পাঠকমাত্রেই তা চোখে পড়বার

কথা।

উৎস ও বিস্তার

উপনিবেশবাদের অনিবার্য পরিণাম হিসেবে অন্যান্য অনেককিছুর মত বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের আবির্ভাব। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরেই বাংলা সাহিত্যে এর উন্মেষ দেবেশ রায় উল্লেখ করেছেন, 'এই বন্দী আমারপ্রাণের' ...ঐ ভাষা আর ঐ আত্মঘোষণার নামই উপন্যাস। এভাবেই ইউরোপীয়রা আমাদের শিখিয়েছেন উপন্যাসকাকে বলে। বাংলাদেশে উপন্যাস রচনার পটভূমি অবশ্য এর আগেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। দুর্গেশনন্দিনীর আয়েষারকণ্ঠে এই যে নির্ভীক, দর্পিত ব্যক্তিত্বের আত্মঘোষণা শোনা গেল, উপন্যাসের মর্মকথা সেটাই। ব্যক্তির বিকাশ ঘটতে ঘটতে তৈরি হয় উপন্যাস, আবার ব্যক্তির বিকাশ সাধনেও উপন্যাস পালন করে গুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ কখনও কখনও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ কিংবা ব্যক্তিসর্বস্বতায় পর্যবসিত হয়েছে। তবে উপন্যাসের মূল কথা এটাইযেতাতে ব্যক্তি নানান রঙে, নানান ঢঙে উঠে এসেছে। তবে একক কোন অনুভূতি নয় 'রাজনৈতিক আন্দোলনের কালপঞ্জি নয় কিংবা কেবল আত্মপ্রতিষ্ঠার সংকল্প ঘোষণাও নয়, বরং জীবনযাপনের মধ্যে মানুষের গোটা সত্তাটিকে বেদনায়, উদ্বেগে ও আকাঙ্ক্ষায় প্রকাশের দায়িত্ব নেয় উপন্যাস।' মানুষের 'সমগ্র সত্তাটির প্রতি' থাকে ঔপন্যাসিকের মনোযোগ। উপনিবেশের কালে ব্যক্তিকে ঔপনিবেশিক শক্তি আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ দেয়নি, বরং তাকে 'খঞ্জ' করেতুলেছে। কিন্তু উপন্যাসের সৃষ্টি হলেও ঔপনিবেশিক মানসিকতার বিপক্ষেই তা অবস্থান করে নিয়েছে। উপনিবেশের অধীনে থাকা লেখকেরা তাই ছিঁড়েখুঁড়ে যাওয়া 'ব্যক্তির নিঃসঙ্গতাকে শনাক্ত করে মানুষের সঙ্গে মিলিত হওয়ার স্পৃহাকে জাগিয়ে' তুলেছেন। উপন্যাস সম্পর্কে এরকমই পর্যবেক্ষণ ছিল আমাদের কালের একজন প্রধান ঔপন্যাসিক আখতাজ্জামান ইলিয়াসের।

সমসময়ের অন্য আরেক ঔপন্যসিক দেবেশ রায় আরও একটু এগিয়ে বলেছেন, উপন্যাসের অন্বিষ্ট সমাজনয়, সময় নয়, ইতিহাসও নয়। উপন্যাসে অন্বিষ্ট ব্যক্তিমানুষ। সময় সমাজ আর ইতিহাস ব্যক্তিচরিত্র ও মানুষের সঙ্গে সম্পর্ককে জটিল করে দেয়। ঔপন্যাসিককে এই মানুষকেই বারবার খুঁজতে হয় আর তাকে খুঁজতে গিয়ে 'সমাজ,সময় আর ইতিহাসকেও খুঁজতে হয়।' ঔপন্যাসিকের তাই কাজ হচ্ছে, 'একদিকে ব্যক্তিমানুষ আর একদিকে সময় -এই দুই দুয়ের ভিতর সঙ্গতি আবিষ্কার করা'। এ জন্যেই বলা যায় উপন্যাসের উপজীব্য হচ্ছে ঔপন্যাসিক কর্তৃক সমন্বিত মানুষ। এই মানুষের আবার থাকা চাই একটা জলজ্যান্ত সজীব পটভূমি, যে-পটভূমিকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের চরিত্রগুলো বিচরণ করে, তৈরি করে 'সময়ান্বিত ব্যক্তির জটিলতা' আর ইঙ্গিত দেয়---ইতিবাচক বা নেতিবাচক যাই হোক না কেন --- পরবর্তী সম্ভাবনার। জেমস জয়েসের ডাবলিন কিংবা আখতাজ্জামান ইলিয়াসের 'কাহালু - কাৎলাহারে'র পটভূমি ছাড়া তাই তাদের উপন্যাসের কথা কল্পনাই করতে পারব না। আমরা। ভারতের অমিতাভ ঘোষ ইংরেজিতে উপন্যাস লিখে যাঁর খ্যাতি, তিনিও বলেছেন। একটা নির্দিষ্ট স্থানকে ঘিরেই গড়ে ওঠে উপন্যাস। পটভূমি তাই উপন্যাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ; প্রাচীন গল্পগাথা থেকে পৃথক হয়ে এভাবেই জন্ম হয় উপন্যাসের । সাম্রাজ্যবাদের চেহারাও এই পটভূমির সূত্রে স্পষ্ট হতে থাকে পাঠকের কাছে।

বাংলা উপন্যাসের সূচনাপর্বে---আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে --- বাঙালি ঔপন্যসিকদের জন্যেও তৈরি হয়ে গিয়েছিল চমৎকার পটভূমি। উপনিবেশের ভেতর থেকেই তখন তৈরি হয় একটা এলিট শ্রেণি। নাগরিক জীবনের অভিজ্ঞতাও পেতে থাকেন বাঙালি লেখকেরা। বর্ণহিন্দু আর ইংরেজি শিক্ষিত নববাবু, বেণিয়ান, মুৎসুদ্দিদের দ্বন্দ্ব তাই যখন তুঙ্গে ওঠে, তখনই লেখা হয় 'নকশা' জাতীয় রচনা। এই নকশাগুলোই ছিল বাংলা উপন্যাসের অপরিণত আদি ফর্ম বা আঙ্গিক। কিন্তু রোমান্টিকতার ভিয়েনে ইউরোপীয় আদলে হঠাৎ করে উপন্যাস লিখে বঙ্কিমচন্দ্রবাংলা আখ্যান বা ন্যারেটিভেরই গতিমুখ বদলে দিলেন। একেবারে সর্বনাশ করে ছাড়লেন এর। এভাবেই রোমান্টিকতার ভূত 'পারিবারিক' 'সামাজিকের' আবরণে বাংলা উপন্যাসের উপর চেপে বসল। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ছাড়াভারতীয় বা বাঙালিরা যে তখন ব্রিটিশি সাম্রাজ্যবাদের অধীনে নিষ্পেষিত হচ্ছিল, অন্য কারও উপন্যাস পড়ে তা বুঝবার উপায় নাই।

ঔপনিবেশিক কালে বাঙালি হিন্দু সমাজের মধ্যে এরকম নানা আলোড়ন দেখা দিলেও মুসলমান সমাজ ছিল ঘুমিয়ে। আত্মসত্তার জাগরণ তখনও তাদের ঘটেনি। তারা উপন্যাসেরও বিষয় হয়ে উঠতে পারেননি। সামন্ত পটভূমি ছেড়ে নতুন কালের সঙ্গে যুক্ত হবার কোন বাসনাও তাদের মধ্যে দেখা দেয়নি। এভাবেই মুসলমানেরা সমকালীন নাগরিক সমাজ ও ইউরোপীয় শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত না থাকবার কারণে আধুনিক ন্যারেটিভকে আত্মস্থ করতে পারেনি। আত্মস্থ করবার গরজও তৈরি হয়নি, দোভাষি পুঁথির ভাষা ও কাহিনির মধ্যেই মুসলমান লেখকেরা আবদ্ধ থেখেছেন। একজন মীর মোশারফ হোসেনকে পেতে তাই আমাদের আরোও দুই দশক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। তিনিও বঙ্কিমের ভাষারীতির নিরাপদ ছায়াতলে থেকে পুরোপুরি পুঁথি রচয়িতাদের অনুসরণে বিষাদসিন্দু রচনা করলেন। বাংলাদেশের অনেকেই আজকাল বাংলা ভাষার মূলরীতিটি কোলকাতার মান্যভাষার আদলে তৈরি হয়েছে বলে হিন্দু লেখকদের দায়ি করে থাকেন। মিন্তু মীর মোশারফ হোসেনের বিষাদসিন্ধুর তুমুল জনপ্রিয়তা যে ঐ মান্যভাষাগ্রহণে মুসলমানদের প্রভাবিত করেছিল, সেকথা কেউ ভেবে দেখেন না।

দেবেশ রায় ঠিকই লক্ষ করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে কল্লোল যুগ পর্যন্ত (রবীন্দ্রনাথ ছাড়া) বর্ণহিন্দু সমাজেরমধ্যে স্থাপিত ব্যক্তির সংকট ও টানাপোড়েনই ছিল বাংলা উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু। সাম্রাজ্যবাদ বা উপনিবেশবাদের ছায়া তাতে পড়েনি। শুধু কী বাঙালি হিন্দু সমাজ, বাঙালি মুসলমান নায়ক - নায়িকা বা আত্মীয় - স্বজনদের সম্পর্ককেও কি উপনিবেশবাদ সংকটাপন্ন করে তোলেনি? লক্ষ করলে দেখা যাবে , বাংলাদেশের প্রথম দিককার উপন্যাসগুলো লেখা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। প্রচণ্ড না হলেও বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে যুদ্ধ ও পঞ্চাশের মন্বন্তরের ধাক্কা এসে লাগে। সেই সঙ্গে তীব্রতা পায় পাকিস্তান আন্দোলন, বেধে যায় দাঙ্গাহাঙ্গামা, ঘটে দেশভাগ, কিন্তু পাঁচ ও ছয়ের দশকে বাংলাদেশে যারা উপন্যাস লিখলেন---আবুল ফজল, শওকত ওসমান, আবুদ শদ, আবু ইসহাক, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, রশীদ করীম, সরদার জয়েনউদ্‌দীন---তাদের কারও রচনাতেই এসব তীব্রমথিত ঘটনার প্রতিফলন পড়ল না। গ্রামের যে চেহারা পাওয়া গেল তা সামন্তশাসিত সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন, বিবর্ণ, দুর্ভিক্ষপীড়িত, স্থবির গ্রাম। দ্বন্দ্ববিক্ষুদ্ধ রাজনীতিকে বাংলাদেশের কোনও ঔপন্যসিকই তাদের উপন্যাসের বিষয়বস্তু করলেন না। বাংলা উপন্যাসের অব্যবহিত পূর্বের তিন দিকপাল---তিন বন্দ্যোপাধ্যায়---মানিক, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্করের শৈল্পিক ও বিষয়বস্তুগত ঐতিহ্য স্বীকৃত হলো না। বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ছিলেন অবশ্যইব্যতিক্রম, ঐ সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী ঔপন্যাসিক। ভাষা ও শৈলীর দিক থেকে তাঁর সিদ্ধি অবিস্মরণীয়। কিন্তু তাঁর রচনাতেও রাজনীতি বা উপনিবেশলাঞ্ছিত মানুষের ছবি ভালভাবে পাওয়া গেল না। উপজীব্য হল না বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর জীবন।

দেশবিভাগের পর ঢাকা হল নতুন প্রাদেশিক রাজধানী। মুঘল স্মৃতিবিজড়িত এই শহরটির গা থেকে খসে পড়ল বিলীয়মান ক্ষয়িষ্ণু কাল ও শাসকদের সামন্তচিহ্ন, আর তাতে লাগল আধুনিকতার জেল্লা। ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় সৃষ্টি হয়ে গেছে নাগরিক মধ্যশ্রেণি, যারা ঢাকা রাজধানী হওয়ার পর আরও ফুলেফেঁপে উঠল, পরিণত হল এলিট শ্রেণিতে। উপন্যাস রচনার প্রকৃত পটভূমি সেই প্রথম পাওয়া গেল বাংলাদেশে । স্বপ্ন- আকাঙ্ক্ষা ও আত্মবিকাশের পাশাপাশি ব্যক্তির সংকটও ঘনীভূত হলো। বিশেষ করে নাগরিক মধ্যবিত্তশ্রেণির অন্তঃসারশূন্যতা, সংকীর্ণতা, আত্মপ্রতিষ্ঠার সংকট আর উঠতি বড়োলোকদের লোভ, নিষ্ঠুরতা, জৌলুস এতটাই তীব্র হয়ে দেখা দিল যে আমাদের সমকালীন ঔপন্যাসিকেরা---রশীদ করীম, শওকত আলী, সৈয়ত শামসুল হক, রাজিয়া খান, আবদুল গাফফার চৌধুরী---বিচ্ছিন্নতাবোধ, অনিকেত চেতনা, নাগরিক বিকার ও ভাবালু রোমান্টিক প্রেমকে তাদের উপন্যাসের বিষয় করে তুললেন। গ্রামজীবনকেও যারা উপন্যাসের বিষয়বস্তু করেছিলেন---শহীদুল্লাহকায়সার, আলাউদ্দিন আল আজাদ---তাদের রচনাও হাসান আজিজুল হকের পর্যবেক্ষণ অনুসারে 'নিখুঁত সমাজবাস্তবতা' এবং 'প্রকৃতি আর ভাগ্যের বিদ্ধে সংগ্রামের একটি দলিল হিসেবেই থেকে যায়।' লক্ষণীয় হল, আখতাজ্জামান ইলিয়াসের চিলেকোঠার সেপাই' ছাড়া এই

সময়ের কোন উপন্যাসেই রাষ্ট্রের সংগ্রাম যে কতটা তীব্র হয়ে উঠেছিল--- বিশেষ করে ভাষা -আন্দোলন, আইয়ুব সামরিক শাসন আর ছেষট্টি -উনসত্তরের উত্তাল স্বাধিকার আন্দোলনের পরিচয় তেমন একটা ধরা পড়েনি। 'চিলেকোঠার সেপাই' ও লেখা ও প্রকাশিত হয় স্বাধীনতার পর। কিন্তুঘাটের দশকে ঝিজুড়ে তৈরি হয়েছিল স্নায়ুযুদ্ধের পরিবেশ, পূর্ব বাংলা ছিল সাম্রাজ্যবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ আর সামরিক শাসনের অধীন ---এসব আন্তর্জাতিক-রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গ যে ব্যক্তিজীবনকে প্রভাবিত করতে পারে, কোনো উপন্যাসেই তা উপজীব্য হল না। আমি অবশ্য ভুলে যাইনি যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সদ্যপ্রকাশিত বাংলায় অনূদিত একমাত্র ইংরেজি উপন্যাস 'দি আগ্‌লি এশিয়ান' -এর কথা (দ্রষ্টব্য প্রথম আলো, ঈদ সংখ্যা ২০০২)। এই উপন্যাসেই উল্লিখিত প্রসঙ্গগুলো চমৎকারভাবে তুলে এনেছেন ওয়ালীউল্লাহ, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের অনগ্রসর দেশগুলোকেকিভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সেইসব দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে বা বাইরে থেকে কাজ করে তার চমকপ্রদ বিবরণ পাওয়া যায় এতে। তবু এই তথ্যটিও তো ভুলে যাওয়া যাবে না যে ওয়ালীউল্লাহ্‌ তাঁর জীবদ্দশাতে এই উপন্যাস প্রকাশ করে যাননি বা তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশের নির্দেশ দিয়ে যাননি। ইংরেজি ভাষায় উপন্যাস লেখার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক হিসেবে গ্রাহ্য হওয়ার ইচ্ছেও হয়ত তার ছিল।

নিজের জায়গা নিজের জমিন

দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম আর রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের উপন্যাস সার্বিক অর্থেই বহুমুখী চারিত্র অর্জন করেছে বলা যায়। কী বিষয়বস্তু, কী ভাষা, কী শৈলী---সবদিক থেকেই বাংলাদেশের উপন্যাস আজ অনেকটাই আন্তর্জাতিক কথাসাহিত্যের প্রতিস্পর্ধী। বিশেষ করে আশি ও নববইয়ের দশকে আমরা এমন কয়েকজন নতুন ঔপন্যাসিককে পেয়েছি, যারা উপন্যাসের শিল্পসিদ্ধি বিষয়ে খুবই সচেতন। এমনকি স্বাধীনতার আগে লেখা শু করে স্বাধীনতার পরও যাঁরা সক্রিয় থেকেছেন, তাঁরাও উপন্যাসের এই দিকটি সম্পর্কে সমান সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে যাদের নাম উল্লেখ করতে হয় তারা হলেন সেলিনা হোসেন, সৈয়দ শামসুল হক ও শওকত আলী। তবে এদের শীর্ষে যার নামটি উল্লিখিত হওয়া প্রয়োজন তিনি হচ্ছেন আখতাজ্জামান ইলিয়াস। মাত্র দুটি উপন্যাস 'চিলেকোঠার সেপাই আর 'খোয়াবনামা' লিখেছেন তিনি, কিন্তু মানবীয় অস্তিত্ব, তার সংকট আর সম্ভাবনার ছবিটি তাঁর উপন্যাসে এতটাই উজ্জ্বল যে তাকে সবার মধ্যে থেকে আলাদা করে চিনে নিতে কোন কষ্ট হয় না। তিনি শৈলী আর ভাষার টেক্সচারকে উপন্যাসের বিষয়, পটভূমি ও চরিত্রের সঙ্গে এমনভাবে সমীকৃত করে দিয়েছেন যে ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। আমার মতে বাংলা উপন্যাসের তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর তিনিই হচ্ছেন ঐ মাপের বড়ো ঔপন্যাসিক। আমাদের এই প্রবন্ধের আলোচ্য তিনি নন, তবু এ প্রসঙ্গে আরও একজন ঔপন্যাসিকের কথা এখানে উল্লেখ করতে হয়, 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' -এর দেবেশ রায়।

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে বাংলাদেশের জাতিরাষ্ট্রের চরিত্র হয়ে উঠেছিল বেশ সম্ভাবনাময়। কিন্তু অচিরেই রাজনীতির কুটিল আবর্তে পড়ে তা হয়ে উঠল বিনাশী আর পরাজয়ের চিহ্নবাহী। বৃহত্তর ব্রাত্য জনগোষ্ঠীর স্থান গেল একেবারে সংকুচিত হয়ে। আজ এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে গেছে ব্যক্তির অবস্থান, যেন বিন্দুসদৃশ হয়ে যাচ্ছে তার অস্তিত্ব। আর এরই বিপরীতে শক্তিশালী হচ্ছে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। বিায়নের প্রভাব-প্রতিপত্তিও ব্যক্তিঅস্তিত্বকে বিলীন করে দিতে উদ্যত। স্বাধীনতার মাত্র আড়াই বছরের মাথায় এই অবস্থার সূত্রপাত অর গত তিন দশকে তা এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব সমূলে উৎপাটিত হওয়ার মুখে। বাংলাদেশের উপন্যাসেও পড়েছে তার ছায়া। কিন্তু কেমন করে এই অবস্থার সৃষ্টি হল বুঝতে হলে তৃতীয় বিশ্বের একটি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় চরিত্রটি বুঝে নিতে হবে। শুধু দেশীয় শাসনব্যবস্থা নয়, আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসম্পর্কের সূতোয় বাঁধা আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব।

রাষ্ট্র নিয়ে যারা নিরন্তর গবেষণা করে চলেছেন তারা দেখিয়েছেন যে শিল্পবিপ্লবোত্তর বিশ্বে শক্তিশালী পুঁজির গঠন একসময় বুর্জোয়া বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটায় এবং তা থেকে আবির্ভাব ঘটে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর। কিন্তু এর বিপরীতে তৃতীয় বিশ্বের অনগ্রসর দেশগুলো সাম্প্রতিক সময়ে গড়ে ওঠে ঔপনিবেশিক শাসনপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। ঔপনিবেশিক শাসকেরা দেশীয় সামাজিক গোষ্ঠীগুলোকে নিজেদের অধীনে রাখার জন্যে জন্ম দেয় এক শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রের। ফলে বুর্জোয়া বিকাশ ছাড়াই স্বাধীন হয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো যখন পশ্চিমের আধুনিক রাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে শাসনকার্য শু করে, তখনই দেখা দেয় নানা অসংগতি ও বিপর্যয়। এই ধরনের রাষ্ট্রের ওপর চেপে বসে সামরিক-আমলাতান্ত্রিক ক্ষুদ্র কোন গোষ্ঠীর শাসনব্যবস্থা। এরকম অবস্থায় ঐ দেশগুলোর শাসনকর্তৃত্ব আর রাজনৈতিক দলগুলোর নিয়ন্ত্রণে থাকেনি। রাজনীতিবিদরা শুধু দেশ শাসনের ব্যাপারে পরিপূরক ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হয়েছেন। ফলে দেখা যায়, স্বাধীনতা অর্জনের পর আর কোন শ্রেণি রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা পায়নি, বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী শ্রেণিকে রাষ্ট্রের মধ্যে স্থান করে দিতে হয়েছে।

এরকম অবস্থায় পেশাজীবী ও বেতনভোগীরা (সামরিক ও আমলা) রাষ্ট্রশাসন প্রক্রিয়ায় নতুন ভূমিকা নিয়ে আবির্ভূত হয়। তারা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী আধিপত্যকামী শ্রেণির মধ্যে মধ্যস্থকারির ভূমিকা পালন করে। আর এসব করতে গিয়ে অর্থনৈতিক কর্তৃত্বও অর্জন করে রাষ্ট্র, যদিও চূড়ান্ত বিচারে পুঁজিবাদী দেশগুলোই অর্থনীতির কলকাঠি নাড়ছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে তাদের হাতের পুতুল হয়ে থাকতে হয়। এসব রাষ্ট্রের হাতে দেশ শাসনের ক্ষমতা পুরোপুরি ভাবে কেন্দ্রিভূত হলেও ঔপনিবেশিক শাসনপ্রক্রিয়াকে উত্তরাধিকার হিসেবে পাওয়ার ফলে তাদের নিজস্ব বিকাশ হয় বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে কিংবা বিকৃত-বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর উপর তাই তারা নির্ভরশীল থাকতে বাধ্য হয়। দেখা গেছে দুর্বল, বিকৃত, নির্ভরশীল অর্থনীতির কারণে অনগ্রসর দেশগুলোতে কোন শক্তিশালী শ্রেণির আবির্ভাব সম্ভব হয়নি। রাষ্ট্রযন্ত্রই সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীগুলোর স্বার্থরক্ষা করেছে। এসব সত্তেও অন্তর্গতভাবে এই দেশগুলো বেশ দুর্বল আর রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল থেকে যায়। অল্প কিছুদিন পর পর কোন না কোন রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটা এইসব রাষ্ট্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। শাসকগোষ্ঠী অনেক কিছু জোর করে জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়, পরিনামে জন্ম হয় স্বৈরাচারী রাষ্ট্রের।

গবেষকরা লক্ষ করেছেন, স্বাধীনতা অর্জনের পর প্রথম দু'দশকে বাংলাদেশে কোন একক আধিপত্যবাদী শ্রেণির সৃষ্টি হয়নি। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থারই সম্প্রসারণ ঘটেছে। এর ফলে বাংলাদেশে কোন দেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণির বিকাশ ঘটেনি। অর্থনীতির ভিত্তিও বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। বৈদেশিক সাহায্যের উপর বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকতে হয়। সময়েরপরিক্রমায় রাষ্ট্র হিসেবে নীতি নির্ধারণের কর্তৃত্ব চলে যায় বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা কিংবা দাতাগোষ্ঠীর হাতে। সবমিলিয়ে দেখা যায়, স্বাধীনতার প্রথম দু'দশকে বাংলাদেশ ছিল সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের কবলে আর দাতাদেশগুলোর উপর নির্ভরশীল। কিন্তু বেসামরিক - সামরিক গোষ্ঠীর দেশ শাসন করবার কোন বৈধতা ছিল না। তারা রাজনৈতিক দলগুলোর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দেশীয় সম্পদের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। দেশ শাসনেও সুযোগ করে নেয় নিজেরাই। বাংলাদেশ এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে শাসকগোষ্ঠী তাদের শাসনব্যবস্থাকে সুসংহত করবার জন্যে কিংবা বৈধতা দেওয়ার জন্যে তিন ধরনের মতাদর্শ ব্যবহার করছে জাতীয়তাবাদ, ধর্ম ও আধুনিকায়ন। এসব মতাদর্শের দ্বন্দ্ব - সংঘাতে জর্জরিত হয়েছে বাংলাদেশ, যার শিকার হয়েছে সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যেসব প্রসঙ্গ মীমাংসিত হয়ে গিয়েছিল---যেমন বাঙালি জাতীয়তাবাদ কিংবা ধর্ম রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে কোন ভূমিকা রাখবে না---সেইসব প্রসঙ্গকে রাষ্ট্রনীতি হিসেবে ছেঁটে ফেলার ফলে আত্মপরিচয়ের সংকট দেখা দেয়, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকেরাও এসব মতাদর্শ বা ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, লিখেছেন নানা ধরনের উপন্যাস। বিষয়বস্তুর দিক থেকে বললে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, রাজনৈতিক টানাপোড়েন, গ্রামীন জীবন, মধ্যবিত্তের অস্তিত্বসংকট, ইতিহাসজিজ্ঞাসা, মনোবিকার, ব্রাত্যজনদের দ্রোহ, প্রতিবাদ - প্রতিরোধ বাংলাদেশের উপন্যাসে নানান আঙ্গিকে, নানান ভাষায় উপজীব্য হয়েছে। স্বাধীনতার পূর্বে বা তারও আগে কথাসাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক হিসেবে যাদের আবির্ভাব ত

াদের মধ্যে স্বাধীনতার পরও সক্রিয় থেকেছেন শওকত ওসমান, আবু জাফর শামসুদ্দীন, রশীদ করীম, সরদার, জয়েনউদ্‌দীন, সৈয়দ শামসুল হক, শওকত আলী, রিজিয়া রহমান, হাসনাত আবদুল হাই, আখতাজ্জামান ইলিয়াস, রাবেয়া খুতুন, রশীদ হায়দার, আহমদ ছফা, সেলিনা হোসেন, আবুবকর সিদ্দিক, হুমায়ুন আহমদ, মাহমূদুল হক প্রমুখ। নতুন কয়েকজন ঔপন্যাসিকের আবির্ভাবও বাংলাদেশের এই সময়ের উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন হরিপদ দত্ত, সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জু সরকার, শহীদুল জহির, ইমদাদুল হক মিলন, ইমতিয়ার সামীম, সাদ কামালী, আকিমুন রহমান, নাসরীন জাহান, প্রশান্ত মৃধা, জাকির তালুকদার, মামুন হুসাইন, আহমাদ মোস্তাফা কামাল ও মুহম্মদ নূল হুদা।

এই লেখকদের, বিশেষ করে তণদের মধ্যে উপন্যাস সম্পর্কে সচেতনতা পূর্বপ্রজন্মের ঔপন্যাসিকদের তুলনায় এখন অনেক বেশি। উপন্যাসের শৈলী সম্পর্কে তারা যেমন সচেতন, তেমনি এরা ভাষা, কাহিনিবিন্যাস ও চরিত্র নির্মাণ সম্পর্কেও তাদের সচেতনতা প্রায় শিখরস্পর্শী। কখনও আত্মজৈবনিক দৃষ্টিকোণ, কখনও যাদুবাস্তবতা, লোকপুরাণ, লোককাহিনি, পুঁথি কিংবা রূপককথার আখ্যানরীতিকে গ্রহণ করে নিরীক্ষাধর্মী গদ্যে তারা উপন্যাস লিখে চলেছেন। উপন্যাসের আসলে কোন বিষয় নেই, 'লেখক কর্তৃক রচিত সময়ান্বিত ব্যক্তির জটিলতাই' উপন্যাসের বিষয়। ফলে অলস মধ্যাহ্নের বিছানায় বা সোফায় গা এলিয়ে স্রেফ বিনোদনের জন্যে হিন্দি ফিল্মের বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশের যে পাঠক বা পাঠিকা উপন্যাস পড়ছেন, তাকে লক্ষ করে সুসমন্বিত তৃপ্তিদায়ক কোন কাহিনি নয় -- 'সমাজ, সময় আর ইতিহাসধৃত ব্যক্তিমানুষ' আর তার জটিল অস্তিত্বের অন্বেষণ ও সম্পর্ককে আশি ও নব্বইয়ের দশকে আবির্ভূত বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকেরা উপন্যাসের বিষয় করে তুলছেন। পৃথিবীর প্রধান প্রধান ঔপন্যাসিক---যেমন ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার কথাসাহিত্যিকদের উপন্যাসরীতির দ্বারা বিভাবিত হয়েই তারা বাংলা উপন্যাসে সংযোজন করতে চাইছেন নতুন মাত্রা। এদের কেউ কেউ ব্রাত্যজনকে তাদের প্রধান চরিত্র করে তুলছেন, কেউ হয়ত নারীকে সামাজিক - রাষ্ট্রিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে তার চেহারাটা কেমন দাঁড়ায় বুঝে নেবার চেষ্টা করছেন। কারও কারও উপন্যাসে আবার রাষ্ট্রের সংগ্রাম যে কতটা ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে, আত্মবিনষ্টির চূড়ায় উঠে যাওয়াচরিত্রকে তুলে এনে বিশ্লেষণ করে দেখাচ্ছেন। কারও কারও উপন্যাসে স্থান করে নিচ্ছে এন্‌জিও বা বেসরকারি সংস্থাকে ঘিরে পাকিয়ে--ওঠা গ্রাম্য রাজনীতি ও ব্যক্তিসম্পর্কের কথা। কেউ কেউ আবার মুক্তিযুদ্ধকেও নতুন করে উজ্জ্বল করে তুলছেন নতুন প্রজন্মের চোখে। শুধু নারী বা ব্রাত্যজনদের মত প্রান্তিক চরিত্র শুধু নয়, প্রান্তিক সম্প্রদায়--- যেমন সংখ্যালঘু শ্রেণির মানুষ আজ যে সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে রাষ্ট্রের কোন প্রান্তে চলে যাচ্ছেন কিংবা ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার শিকার হচ্ছেন--- সেই কাহিনিও উপজীব্য হচ্ছে কার কার লেখায়। বাংলাদেশের উপন্যাস, বোঝা যায়, বিচিত্র পথে বিকশিত হয়েছে। ঔপন্যাসিকদের দায়বোধ আরও তীব্র ও গভীর হয়েছে। এক সময় ছিল যখন মধ্যবিত্ত জীবনের সরল পানসে দুঃখবেদনাকেই আমাদের অধিকাংশ ঔপন্যাসিক তাদের উপন্যাসের বিষয় করেতুলতেন, তাতে পাওয়া যেত নিটোল কাহিনি, চরিত্রগুলোও হত একমাত্রিক---অবিরাম বাক্যস্রোতে তারাকিভাবে যে ভেসে যেত বোঝাই যেত না। কিন্তু এখন জীবনের জটিল - কুটিল চেহারাকেই আমাদের ঔপন্যাসিকেরা বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তুলে ধরবার চেষ্টা করছেন। এই সময়ের এরকম কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হচ্ছে 'চিলেকোঠার সেপাই' ও 'খোয়াবনামা' (আখতাজ্জামান ইলিয়াস), 'প্রদোষে', 'প্রাকৃতজন' (শওকত আলী),'গায়ত্রী সন্ধ্যা' (সেলিনা হোসেন), 'জলরাক্ষস' (আবুবকর সিদ্দিক) 'অন্ধকূপে অগ্নিদাহ' (হরিপদ দত্ত), 'জন্মজাতি' (মুহম্মদ নূল হুদা), 'প্রতিমা উপাখ্যান' (মঞ্জু সরকার), 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' (শহীদুন জহির), 'পুষের পৃথিবীতে এক মেয়ে' (আকিমুন রহমান), 'ডানাকাটা হিমের ভিতর' (ইমতিয়ার শামীক),'উড়ুক্কু' (নাসরীন জাহান), 'রাষ্ট্রের সংগ্রাম' (সাদা কামালী), 'মৃত্যুর আগে মাটি' (প্রশান্ত মৃধা) ও 'কুরসিনামা' (জাকির তালুকদার)।

প্রত্যহ শিল্পযাপনে

এই লেখার শুতে বাংলাদেশের পাঠকদের প্রসঙ্গ তুলেছিলাম। বাংলাদেশে উপ্যনাস পাঠকের সংখ্যা খুবই কম, আমাদের পাঠাভ্যাস সীমিত। কথাটা যে সত্যি, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু ঔপন্যাসিকেরাও তার দায় এড়াতে পারেন না। তারা ভাল শিল্পসফল উপন্যাস লিখে পাঠকদের উপন্যাসের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারেন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে শিল্পসফল উপন্যাস রচনায় আমাদের ঔপন্যাসিকেরা তেমন সাফল্য দেখাতে পারেনি। একমাত্র ব্যতিক্রম মনে হয় আখতাজ্জামান ইলিয়াসকে। 'জনপ্রিয়' ঔপন্যাসিকদের মত তিনি হয়ত জনপ্রিয় নন, কিন্তু তারপাঠকপ্রিয়তা ঈর্ষণীয়। বাংলাদেশের সীমান্ত ছাড়িয়ে তা পশ্চিম বাংলার বাঙালি পাঠকদের অভিভূত করতে পেরেছে। এর একটা কারণ এই হতে পারে যে তিনি লেখকদের লেখক। ঔপন্যাসিকদের ঔপন্যাসিক। নবীন, প্রবীন কিংবা উপন্যাস লিখবেন বলে যারা ভাবছেন, অর্থাৎ সবশ্রেণির লেখকই তার লেখা পড়বার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকবেন । বুঝতে চাইবেন তার শিল্পকৃতির গুত্বপূর্ণ দিকগুলো। আরেকটি কারণ, অর্থাৎ প্রধান কারণটি হচ্ছে তিনি সার্বিক অর্থে চমৎকার শিল্পসফল দুটি উপন্যাস লিখেছেন। চিশীল পাঠকদেরও তিনি উপন্যাস পাঠে প্রলুব্ধ করতে পেরেছেন। কিন্তু খুব সহজে বা অনায়াসে এই সাফল্য তিনি অর্জন করতে পারেননি, পারা হয়ত সম্ভবও নয়, লেখালেখি সম্পর্কে তার নিষ্ঠা ছিল প্রায় কিংবদন্তীতুল্য। একটি লেখাকে কিংবা লেখার কোন অংশকে দিনের পর দিন নানাভাবে কাটছাঁট করে, বাদছাঁদ দিয়ে প্রকাশের উপযোগী করে তিনি দাঁড় করাতেন। শিল্পের প্রতি এই নিষ্ঠার কারণেই হয়ত তিনি মাত্র দুটি উপন্যাস লিখে যেতে পেরেছেন।

কিন্তু কিভাবে কাজ করলে কিংবা উপন্যাস রচনার সঙ্গে যুক্ত হলে ভাল উপন্যাস লেখা সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মোটেই সহজ নয়। একমাত্র যিনি উপন্যাস লিখেছেন, তিনিই বলতে পারবেন এই প্রক্রিয়ার কথা। একটা ব্যাপারে অবশ্য কোন সন্দেহ নেই যে উপন্যাস লেখায় যিনি হাত দেবেন, তার প্রস্তুতি থাকতে হবে ব্যাপক। উল্লেখযোগ্য বাংলা উপন্যাস তো বটেই, এ যাবত রচিত বিশ্বের সেরা উপন্যাসগুলোও তার পড়া থাকা দরকার। উপন্যাসের ধরন, শৈলী, ভাষা কাহিনিবিন্যাস, চরিত্রচিত্রণ ইত্যাদির রূপ - রূপান্তর সম্পর্কেও তার স্পষ্ট ধারণা থাকা জরি। শুধু ধারণা নয়, কিভাবে এসব বিষয়কে স্বকীয় করে নিয়ে শিল্পসফল প্রাতিস্বিক উপন্যাস রচনা করা যায়, সেই সচেতনতা ও প্রতিভাও তার থাকা চাই।

অমিতাভ ঘোষ তার সাম্প্রতিক একটি লেখায় জানাচ্ছেন যে আন্তর্জাতিক শিল্পমাধ্যম হিসেবেই আবির্ভাব ঘটে উপন্যাসের। গত এক শতাব্দী ধরে উপন্যাস প্রকৃত অর্থেই আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছে। প্রকরণ হিসেবে শু থেকেই উপন্যাস আন্তর্জাতিক। এই আন্তর্জাতিকতার টানে লেখা হচ্ছে ভারতীয় ইংরেজী কথাসাহিত্য। এমনকি সেই আঠারো শতকে হিস্পানি, ইংরেজ, ফরাসি ও শ ঔপন্যাসিকেরা একে অন্যের লেখা পড়তেন আর তার দ্বারা প্রাণিত হয়ে উপন্যাস লিখতেন। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আমরা জানি ইউরোপীয় উপন্যাসরীতিকে গ্রহণ করেই উপন্যাস রচনা শু করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ইউরোকেন্দ্রিকতার বিদ্ধে প্রবল আপত্তি থাকা সত্ত্বেও গার্সিয়া মার্কেজ ও উইলিয়াম ফকনারের অনুরাগী পাঠক, নোবেল পুরস্কার ভাষনে তিনি তা অকপটে উল্লেখ করেছেন। মার্কেজ বা ল্যাটিন আমেরিকার কথাসাহিত্যিকেরাও শৈলী হিসেবে যে যাদুবাস্তবতাকে অবলম্বন করেছেন, বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিকদের অনেকের লেখাতেই আমরা এখন সেই রীতির প্রভাব লক্ষ করছি। হোমি ভাবা ---এই সময়ের একজন মেধাবী সাহিত্যতাত্ত্বিক--- আমাদের জানাচ্ছেন যে যাদুবাস্তবতার এই রীতিটি এখন হয়ে উঠেছে উত্তর - ঔপনিবেশিক রাষ্টগুলোর সাহিত্যের ভাষা।

এই ঋণ সত্ত্বেও সুস্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন যে, জাতি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুসারে কথাসাহিত্যের বর্ণনারীতি বা ন্যারেটিভকে গ্রহণ করে থাকে। এর উৎস হিসেবে কাজ করে সংশ্লিষ্ট জাতির নৃতাত্ত্বিক -সাংস্কৃতিক - পৌরাণিক - সামাজিক - রাজনৈতিক ঐতিহ্য। বাখতিন এজন্যেই বলতে পেরেছেন, 'লোকসাহিত্যের মধ্যেই উপন্যাসের শেকড় খুঁজতে হবে।' উপন্যাসের উৎস সন্ধান যারা করেছেন তারাও দেখেছেন যে ভারতের 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'জাতক' আর ইউরোপে 'ট্রস্টান ও ইসোল্ডে'র

কাহিনিগুলোই হচ্ছে উপন্যাসের পূর্বসূরি। তবে উপন্যাস হয়ে উঠবার অনিবার্য শর্ত—'স্থান' বা 'পটভূমি'র কোন সুস্পষ্ট রূপ ঐসব গল্পে পাওয়া যায় না। উপন্যাসের মত কোন একটা 'নির্দিষ্ট স্থান'কে ঘিরে ঐ গল্পগুলো গড়ে ওঠেনি। জাতীয় ঐতিহ্যের প্রভাব যে উপন্যাসের উপর পড়েছে তাই নয়, জাতিগঠনেও উপন্যাস গুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন নামের আরেক ভাবুক রাষ্ট্রগঠন প্রসঙ্গে তাই বলেছেন, আধুনিক জাতিরাষ্ট্র গঠনে সাহিত্যের ভূমিকা ছিল প্রধান। ছাপার মাধ্যম বা 'প্রিন্ট মিডিয়া'র কল্যাণে আধুনিক জাতিরাষ্ট্রগুলো সৃষ্টি হয়। আর প্রিন্ট মিডিয়ার একটি শক্তিশালী মাধ্যম 'উপন্যাস' আধুনিক জাতিরাষ্ট্র গঠনে গুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপন্যাসের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক, বিশেষ করে জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক, অনেকের মতে একারণেই অত্যন্ত নিবিড়। ইউরোপের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে তাই যখন জাতীয়তাবাদ ও জাতিরাষ্ট্র গঠিত হচ্ছিল, ঠিক তখনই সাহিত্যে আবির্ভাব ঘটে উপন্যাসের। উপন্যাসই জাতিরাষ্ট্রের মাধ্যমে যে 'নতুন সম্প্রদায়ের' সৃষ্টি হয়, সেই সম্প্রদায়ের বিষয় আশয়কে উপজীব্য করে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছে। প্রখ্যাত দার্শনিক ফয়েরবাখ তাই বলেছেন, উপন্যাসের মতো জাতীয় কাঠামোই একইসঙ্গে পেরেছে 'নিচু' আর 'উঁচু' শ্রেণির কথা তুলে ধরতে। তবে আরেক জার্মান ভাবুক ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের মতে উপন্যাস আমাদের যা দেয় তা হচ্ছে 'তথ্য'। ঝিযুদ্ধোত্তর উপন্যাসের এটাই হচ্ছে মূল বৈশিষ্ট্য। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে 'অভিজাত' ও 'সংখ্যালঘু' প্রকরণ হিসাবে উপন্যাসের জন্ম। তবে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মাধ্যমে 'কসমোপলিটান প্রকরণ' হিসেবে এর আবির্ভাব ঘটলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পালন করেছে 'জাতীয় ভূমিকা'। 'জাতীয়' ব্যাপারটি অবশ্য সামান্য কোন ব্যাপার নয়। এর ব্যাপ্তি বা প্রসারও বিপুল। 'জাতি' থেকেই জাতীয়তার উদ্ভব। জাতি বলতে আবার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের এমন এক জনগোষ্ঠীকে বোঝায়, যারা নিজেদের মধ্যে একধরনের অন্তর্গত ঐক্য অনুভব করে। ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ ও পরিণাম একই বলে ভাবে। জাতি আবার একটি - দুটি ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক সম্প্রদায় নয়, অসংখ্য বহুবিচিত্র সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে গড়ে উঠতে পারে। উপনিবেশ - উত্তর উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাই দেখা যাচ্ছে যে এই বহুবিচিত্র সম্প্রদায়েৰ কথাইঔপন্যাসিকেরা তাদের লেখায় তুলে ধরছেন। এভাবেই উপন্যাস একসময় সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবে সৃষ্টি হলেও ক্রমশতা জাতীয় হয়ে উঠেছে। এজন্যেই এখন আমরা দেখি, সাম্রাজ্যবাদের ভেতর থেকে সৃষ্টি হলেও সাম্রাজ্যবাদের বিদ্ধেই উপন্যাস অবস্থান নিয়ে ফেলেছে। ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা বা তৃতীয় বিশ্বের অনগ্রসর যে - কোন দেশেরসচেন লেখকের উপন্যাস পড়লেই তা বোঝা যায়। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই মনে পড়বে গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, মারিয়ো ভার্গাস হোসা, নগুগি বা থিয়োঙ্গো, ওলে সোয়েঙ্কা, চিনুয়া আচেবে, আমোস তুতুওলা, গুন্টার গ্রাস, মিলান কুন্দেরা, বুচি অ্যামেচেটা, আমা আটা আইডু, টনি মরিসন, ন্যাডিন গার্ডিমার, সালমান শদি, অমিতাভ ঘোষ, মহাশ্বেতাদেবী, আখতাজ্জামান ইলিয়াস, দেবেশ রায়, সেলিনা হোসেন প্রমুখের কথা। প্রসঙ্গ - শৈলী - ভাষার দিক থেকে উপন্যাসকে তারা এমন এক উচ্চতায় নিয়ে যেতে পেরেছেন যা প্রকৃতপক্ষেই হয়ে উঠেছে জাতীয় পুরাণ। কিন্তু উপন্যাসশিল্পের প্রতি আদ্যন্ত নিবেদিত না থেকে তারা সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি, কারও পক্ষে তা অর্জন করাও সম্ভভ নয়। শিল্পের প্রতি তাদের নিষ্ঠা প্রায় কিংদন্তীতুল্য বলা যায়। উপন্যাসের ফর্ম নিয়েও তারা অনেক ভেবেছেন। খুঁজে নিতে চেয়েছেন নিজস্ব পথ, শিল্পের বিচারে যা তুঙ্গস্পর্শী।

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর মার্কিন প্লেবয় পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মার্কেজ বলেছিলেন, 'ওয়ানহান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচ্যুড' উপন্যাসটি লিখতে আমার টানা আঠারো মাস সময় লেগেছিল। সকাল নটা থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত লিখতাম। ...যখনই আমি কোন উপন্যাস লিখতে বসি, তখনই ঐ উপন্যাসের জন্যে প্রয়োজনীয় অসংখ্য দলিল - দস্তাবেজ, পেপার কাটিং, রিপোর্ট ইত্যাদি মালমসলা সংগ্রহ করে নিয়ে লিখতে বসি।' শুধু ঐ উপন্যাসটি নয়, 'অটাম্ন্ অব দ্য প্যাটরিআর্ক' উপন্যাসটিও তিনি তিন - তিনবার লিখেছেন। প্রথমবার স্মৃতিচারণার উপর নির্ভর করে 'মনোলগের' (একোক্তি) ভঙ্গিতে লিখেছেন, দ্বিতীয়বার লিখেছেন আত্মজীবনীমূলক রীতিতে, কিন্তু তৃতীয়বার অর্থাৎ সবশেষে লিখেছেন 'মাল্টিপল মনোলগের' (বহুজনের একোক্তি) ভঙ্গিতে। একজন প্রকৃত একনায়কের দৈনন্দিন জীবন কেমন হতে পারে তার খুঁটিনাটি বুঝবার জন্যে চলে গেছেন স্বৈরাচারী শাসক ফ্রাঙ্কোর স্পেনে।কিন্তু স্পেনের বার্সিলোনায় গিয়ে মনে হল আরও কী যেন বোঝা দরকার, কী যেন চাই। এবার তাই স্পেন ছেড়ে পাড়ি দিলনে ক্যারাবিয়াতে, সেখান থেকে আবার নিজের দেশ কলোম্বিয়ায়। সাংবাদিকরা ঘিরে ধরে জানতে চাইলেন,'আবার কি জন্য এখানে এসেছেন?' মার্কেজ বললেন, 'পেয়ারার আসল গন্ধটা যেন কেমন স্মরণ করবার জন্যে এখানে এসেছি।' সবশেষে ফিরে গেলেন সেই বার্সিলোনায়, সেখানে পৌঁছে লেখার টেবিলে বসতেই খুলে গেল উপন্যাসটির উৎসমুখ।

মার্কেজের এই বর্ণনার মধ্যে, কোন সন্দেহ নেই, একজন অস্থির চিত্তের কথাসাহিত্যিকের প্রতিকৃতি আমরাদেখতে পাচ্ছি, যিনি ভাল একটি উপন্যাস লিখবার জন্যে দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে বেড়াচ্ছেন। খুঁজে ফিরছেন উপন্যাসের উপযোগী পটভূমি ও শৈলী। শিল্পের প্রতি এই নিষ্ঠা—বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকদের বেলায় কি দেখতে পাব আমরা? সবার কথা জানি না, কিন্তু অনেককেই দেখছি কোন প্রস্তুতি বা ভাবনা ছাড়াই উপন্যাসের পর উপন্যাস লিখে চলেছে। 'জনপ্রিয়' অভিধা তারা পাচ্ছেন ঠিকই, অর্থাগমও হচ্ছে, কিন্তু দু-একবছর যেতে না যেতেই পাঠকের কাছে তাদের পুরনো লেখার আবেদন ফুরিয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় মনে হয় তারা যেন সারাজীবন ধরে এই ধরনের একটি বা দুটি উপন্যাস লিখে চলেছেন। মার্কেজ নিজেও বলেছেন, 'বাণিজ্যিক দিক থেকে যদি লাভবান হতে চাইতাম, তাহলে আমিও এরকম করতে পারতাম। বাকি জীবন 'ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচ্যুডের' মত উপন্যাস লিখে যেতে পারতাম।' কিন্তু তিনি তা করেননি। 'গড়' 'অনুল্লেখযোগ্য' লেখকের স্তরে তিনি নিজেকে নামিয়ে আনতেচাননি। শুধু মার্কেজ কেন, শিল্পের প্রতি নিষ্ঠা আখতাজ্জামান ইলিয়াসেরও ছিল প্রায় কিংবদন্তীতুল্য। তার নিকটজনদের কাছ থেকে শুনেছি, একটি লেখার অসংখ্য খসড়া করতেন তিনি। যতক্ষণ পর্যন্ত লেখাটির মান সম্পর্কে স্থি হতে না পারতেন ততক্ষণ পর্যন্ত লিখে যেতেন, লিখে যেতেন বারবার।

ঔপন্যসিকের শিল্পসাফল্য অবশ্য শুধু নিষ্ঠা বা শ্রম দিয়ে অর্জন করা যায় না, এর জন্যে চাই প্রতিভাও। সেই সঙ্গে উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কেও ঔপন্যাসিকের ধারণা থাকা দরকার। পঠনপাঠন এ ব্যাপারে ঔপন্যাসিককে সাহায্য করতে পারে। আমি অন্য কোনকিছু নয়, একটি দিক সম্পর্কে সমকালীন বাংলাদেশের কথা - সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই লেখাটির ইতি টানতে চাই।

আমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছি যে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়া হিসেবেই উপন্যাসের সৃষ্টি। বঙ্কিমচন্দ্রের মাধ্যমে বাংলা উপন্যাসেরও যাত্রা শু হয়েছিল সেইভাবে। বঙ্কিমচন্দ্র --- কোন সন্দেহ নেই ---ইউরোপীয় বা উপনিবেশবাদী ন্যারেটিভ রীতিকে গ্রহণ করে বাংলা উপন্যাসের যে গতিপথ তৈরি করে দিয়েছিলেন, বাঙালি ঔপন্যসিকেরা পরবর্তী দেড়শো বছর ধরে সেই রীতি অবলম্বন করে উপন্যাস লিখে চলেছেন। কিন্তু আমাদের নিজস্ব এমন কিছু ন্যারেটিভ ছিল যা গ্রহণ করতে পারলে বাংলা উপন্যাসের চেহারাই অন্যরকম হতে পারত। দেবেশ রায় আমাদের সেইদিকে দৃষ্টি আকর্ষন করলেন। বাংলাদেশে আবহমান কাল ধরে এই ধরনের যেসব ন্যারেটিভ প্রচলিত ছিল সেগুলো হচ্ছে তকথা, পাঁচালি, কথকতা ও কীর্তন। আমরা বাঙালি মুসলমানরা আরও একধরনের ন্যারেটিভের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম—আর তা হচ্ছে পুঁথি। বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে খোঁজ করলে হয়ত আরও কিছু লোকন্যারেটিভের সন্ধানপাওয়া যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র বা তার অব্যবহিত পরে যদি এই ন্যারেটিভগুলো অনুসৃত হত, তাহলে এই লেখার শুতে যে বলেছি, উপনিবেশবাদের আগ্রাসী নষ্টভ্রষ্ট চরিত্রকে আমরা ঠিক ঠিক উন্মোচন করতে পারতাম। সাম্রাজ্যবাদ হয়ত আমাদের উপর যতটা জেঁকে বসেছিল, ততটা জেঁকে বসতে পারত না। আমাদের কথাসাহিত্য নিজস্ব সাংস্কৃতিক ভিত্তির ওপর ঋজু হয়ে দাঁড়াতে পারত। শুধু আত্মস্বাতন্ত্র্য নয়, আত্মমুক্তির জন্যেই এটা ছিল জরি ব্যাপার। বঙ্কিমচন্দ্র বা মীর মশারফেরা না বুঝলেও আলেহো কার্পেন্তিয়ার ঠিকই বুঝেছিলেন প্রাককলোনি কালের বর্ণনারীতি ও গল্পগুলোকে পুনরাবিষ্কারের মধ্যে দিয়েই উপনিবেশের অধীন দেশগুলো তাদের অস্তিত্বের শেকড় খুঁজে পেতে পারে। কস্‌মে

াপলিটন সংস্কৃতির পরগাছা হয়ে থাকার মধ্যে কোন গৌরব নেই।

এই মুহূর্তে বাংলা ভাষাভাষি জনগোষ্ঠীর সংখ্যা পৃথিবীতে চতুর্থ। দূরপ্রাচ্য থেকে মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ থেকে আমেরিকা---সর্বত্র বাংলা ভাষাভাষিরা ছড়িয়ে আছেন। আমাদের ঔপন্যাসিকেরা এখন একদিকে যেমন নয়া সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের দ্বারা চালিত (যার নাম দেওয়া হয়েছে বিশ্বায়ন) বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দ্বারা আক্রান্ত প্রান্তিক, আদিবাসী, কৃষিজীবী, বিলুপ্তপ্রায় লোকজ বা দেশীয় ন্যারেটিভগুলোকেও গ্রহণ করে লিখতে পারেন, চমকপ্রদ উপন্যাস। এই উপন্যাস একইসঙ্গে হয়ে উঠতে পারে দৈশিক ও আন্তর্জাতিক, অভিনব ও তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশের দুর্জ্ঞেয় বিকাশশীল মানুষের অস্তিত্ব - অন্বেষার বিজয়গাথা। এ-দিকটির প্রতি যে আমাদের লেখকদের দৃষ্টি পড়েছে, আগেই তার উল্লেখ করেছি। কিন্তু এক্ষেত্রে যতটা ভাবা গিয়েছিল ততটা গুণগত পরিবর্তন চোখে পড়ছে না। আমাদের ঔপন্যাসিকদের কাছে আমরা আসলে সেই নিষ্ঠা বা শিল্পসচেতনা প্রত্যাশা করি, যাতে বাংলাদেশের উপন্যাস বিশ্বসাহিত্যে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তণ ঔপন্যাসিকেরাই এভাবে পারেন বাংলাদেশের উপন্যাসের সম্ভাবনার পথ খুলে দিতে।

ঢাকা, ১০ আগস্ট ২০০৩

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com